যে কারণে ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না চিনি করপোরেশন

মোহাম্মদ ওমর ফারুক

দৈনিক মানব জমিন, ২৪ নভেম্বর ২০২০, মঙ্গলবার | সর্বশেষ আপডেট: ২:৫৫

যথেষ্ট সম্ভাবনার হলেও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় চিনি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তা ও আখচাষিদের জীবন-জীবিকা দীর্ঘদিন ধরেই সংকটের মধ্যে রয়েছে। উৎপাদিত চিনি অবিক্রীত পড়ে থাকা, চিনির উৎপাদন খরচ বাজারমূল্যের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি হওয়াসহ নানান কারণে সংকটের মধ্যে রয়েছে এই শিল্প। শুধু তাই নয়, বেসরকারিভাবে আমদানিকৃত চিনির সঙ্গে টিকতে পারছে না রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলো। ফলে ডুবতে বসেছে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন। সরকারের সদিচ্ছার অভাবে এমনটা হচ্ছে বলে দাবি করছেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা। ফলে বছরের পর বছর আর্থিক ক্ষতির মুখে এ প্রতিষ্ঠানটি। শুধু তাই নয়, প্রধান কার্যালয় থেকে শুরু করে ১৫টি চিনকলের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকদের গ্র্যাচুয়িটি ফান্ডও দিতে পারছে না তারা। ফলে মানবেতর জীবনযাপন করছেন অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা।

দিনের পর দিন ওই ফান্ডের জন্য আবেদন করেও কূল-কিনারা পাচ্ছেন না তারা। করপোরেশন সংশ্লিষ্টরা ধারণা করছেন, যে কোনো মুহূর্তে সরকার বন্ধ ঘোষণা করতে পারেন প্রতিষ্ঠানটি। তবে প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা বলছেন, গত ফেব্রুয়ারিতে নতুন চেয়ারম্যান সনৎ কুমার সাহা যোগদান করার পর সংকটগুলো সমাধান করার জন্য কিছু উদ্যোগ নিয়েছেন। কিন্তু অদৃশ্য কারণে সেসব বাস্তবায়নে বেগ পোহাতে হচ্ছে তাকে।

যেভাবে শুরু এবং সংকট ও প্রতিষ্ঠানটির সম্পদের পরিমাণ:

১৯৭২ সালের কথা। বাংলাদেশ সুগার মিলস করপোরেশন গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালের ১লা জুলাই বাংলাদেশ সুগার মিল্‌স করপোরেশন ও বাংলাদেশ ফুড অ্যান্ড অ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ করপোরেশনকে একীভূত করে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন গঠন করা হয়। এটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। চিনিকল এবং বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশিল্প প্রতিষ্ঠানসহ মোট ৬৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বিএসএফআইসি'র অধীনে ছিল। পরবর্তীতে ৫০টি শিল্পপ্রতিষ্ঠান বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাবেক মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এরপর থেকেই মূলত ধীরে ধীরে সংকট তৈরি হওয়া শুরু। বর্তমানে করপোরেশনের আওতায় ১৫টি চিনিকল রয়েছে। মূলত করপোরেশনের মূল কাজই চিনি নিয়ে। অথচ করপোরেশন শুরুই হয়েছিল চিনি ও চিনিজাত খাদ্য পণ্য তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে। এদিকে চিনিশিল্পের সহযোগী শিল্প হিসেবে কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড, একটি ডিস্টিলারি কারখানা এবং চিনিকলের যন্ত্রাংশ তৈরির জন্য কুষ্টিয়া শহরে রেনউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোম্পানি (বিডি) লিমিটেড নামে

একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা রয়েছে। এটি পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত কোম্পানি। করপোরেশনের অধীনে ১৯ হাজার ৮৯ একর জমি রয়েছে। মোট সম্পদের পরিমাণ ২৫ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি। হাজার হাজার কোটি টাকা লোকসান হলেও করপোরেশনের অনুমোদিত জনবলের সংখ্যা ১৬ হাজার ২৩৫। বর্তমানে কর্মরত আছেন ৯ হাজার ১৬ জন। তাদের মধ্যে কর্মকর্তা ৭১৪, কর্মচারী ৪ হাজার ৪০১ ও শ্রমিকের সংখ্যা ৩ হাজার ৯০১ জন। এর বাইরে আখমাড়াই মৌসুমে অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ দেয়া হয়। সব কর্মীর বেতন বাবদ মাসে প্রায় ৩০ কোটি টাকা খরচ হয় করপোরেশনের। আখের স্বল্পতার কারণে মিলভেদে বছরে আখমাড়াই কার্যক্রম ৪৭ থেকে ১২৬ দিন পর্যন্ত চলে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ২০০২ সালে চিনি আমদানির অনুমতি দেয়ার পর থেকেই বিপাকে পড়ে রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলো। দেশে উৎপাদিত চিনির তুলনায় আমদানি করা চিনির মূল্য কম হওয়ায় অবিক্রিত থাকছে রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার চিনি। লোকসান গুনতে গুনতে রুগ্ণ হয়ে পড়ে চিনিকলগুলো।

উৎপাদন খরচ বেশি, বিক্রি কম:

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের হিসাব অনুযায়ী যে দামে চিনিকলগুলো তাদের চিনি উৎপাদন করে সেই দামে তারা চিনি বিক্রি করতে পারছে না। ফলে বছরের পর বছর সরকারের ভর্তুকি নিয়ে তাদের চলতে হয়। কিন্তু সেই ভর্তুকিও তারা ঠিকভাবে পাচ্ছেন না বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তারা। জানা গেছে, গত ১৯-২০ অর্থবছরে প্রতিকেজি চিনি উৎপাদনে তাদের খরচ হয়েছে ১৮০.৯২ টাকা। তার বিপরীত তারা তাদের চিনি বিক্রি করেছেন মাত্র ৫৩-৬০ টাকায়। প্রতিকেজি চিনিতে ১২০ টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে প্রতিষ্ঠানটিকে। ফলে চলতি অর্থবছরে প্রভিশনাল হিসাব অনুযায়ী তাদের লোকসান হয়েছে ৯৭১.৪৯ কোটি টাকা। তাদের ১৫টি সরকারি চিনিকলেই বর্তমান বাজারদরের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি দামে উৎপাদিত হচ্ছে চিনি। তাতে গত পাঁচ বছরে ৩ হাজার ৯৭৬ কোটি টাকা লোকসান গুনেছে করপোরেশন। তাছাড়া ৭ হাজার ৮৯৫ কোটি টাকা ব্যাংকঋণের দায় রয়েছে করপোরেশনের ঘাড়ে। শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও গ্র্যাচুয়িটি, ভবিষ্যৎ তহবিল, আখের মূল্য ও সরবরাহকারীর বিল বাবদ বকেয়া পড়েছে ৫৫১ কোটি ৮৬ লাখ টাকা।

মুজরি দিতে পারছে না শ্রমিকদের:

চিনিকলগুলোর শ্রমিকদের মজুরিও দিতে পারছে না ঠিকমতো। শুধু তাই নয়, চিনিকলগুলোতে আখ সরবরাহ করে চাষিরাও পাচ্ছেন না আখের দাম। ফলে প্রায় ১০ হাজার শ্রমিককে মানবেতর জীবনযাপন করতে হচ্ছে। এই ঘটনা নতুন নয়। প্রায়ই চিনিকলগুলো আখচাষিদের পাওনা ও শ্রমিকদের মজুরি দিতে পারে না। তখন হাত পাততে হয় সরকারের কাছে। এবারও সেটাই করছেন তারা। এই বছরের শুরু থেকেই অনেক শ্রমিকের বেতন নেই, তারপরও যার যার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন শ্রমিক, কর্মচারী এবং কর্মকর্তারা। জয়পুরহাটের বেতন না পাওয়া শ্রমিক রমজান আলী বলেন, সাতজনের সংসার চালাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি। টানা তিন মাস বেতন না পেয়ে অভাবে অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে খেয়ে না খেয়ে পরিবারের সদস্যদের দিন কাটাতে হচ্ছে। আরেক শ্রমিক ফিরোজ হোসেন বলেন, বয়স্করা পরিস্থিতি বুঝতে পারলেও শিশুদের কোনোভাবে সামলানো যাচ্ছে না। তারা ভাত ও মাছ খেতে চায়। কিন্তু না পেয়ে কান্নাকাটি করে। বাধ্য হয়ে পরিবারের কথা ভেবে রিকশা চালাচ্ছি। নাটোরের নর্থ বেঙ্গল চিনিকল মিলের শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি গোলাম কাউছার বলেন, বেতন নেই দীর্ঘদিন ধরে। কীভাবে সংসার চালাবে শ্রমিকরা। এটাই বুঝতে পারছি না। মিল আমাদের বেতনের টাকাই দিতে পারছে না। চাষিদের সার কীটনাশক

কীভাবে দিবে? দেশের মানুষের স্বার্থে চিনি-শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তা না হলে সবাইকে ১০০ টাকা কেজি বা তার চেয়েও বেশি দরে চিনি কিনতে হবে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের হিসাব খাতের এক উচ্চপদস্থ কর্মকতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, কোনো মিলে কিছু মজুরি পরিশোধ করা হয়েছে। কিছু কিছু এখনো বাকি আছে। আমরা আর্থিকভাবে অনেক দুর্বল। সরকার সহায়তা না করলে আমরা এই সমস্যা থেকে উঠতে পারবো না।

অর্থসহায়তা বন্ধ

বিএসএফআইসিকে নতুন করে অর্থ সহায়তা দিচ্ছে না সরকার। এমন অবস্থায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে প্রতিষ্ঠানটি। যার ফলে আখচাষিদের আর্থিক সহায়তা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। চলতি মৌসুমে নিবন্ধিত আখচাষিদের সার, কীটনাশক ও সেচের জন্য ঋণ দেয়া সম্ভব হয়নি। তাই আশঙ্কা করা হচ্ছে, আসছে মৌসুমে আখ উৎপাদন কমে যেতে পারে। সেটি হলে লোকসানের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাওয়ার শঙ্কা রয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বর্তমানে শুধু চিনি বিক্রি করে চিনিকলগুলো লাভজনক করা সম্ভব নয়। ৬০ থেকে ৭০ বছরের পুরনো যন্ত্রপাতির আয়ুষ্কাল প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ায় উৎপাদন সক্ষমতা কমে গেছে। পর্যাপ্ত আখও পাওয়া যাচ্ছে না। ব্যবস্থাপনা ও বিপণনের দক্ষতায়ও রয়েছে বড় ধরনের ঘাটতি। চালু ১৫টি চিনিকলের মধ্যে ১০টি চিনিকলের অর্থনৈতিক আয়ুষ্কাল ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেলেও যথাযথ মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিএমআরকরণের মাধ্যমে এগুলো চালু রাখা হয়েছে।

গ্র্যাচুয়িটি ফান্ড পাচ্ছে না অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিকরা:

দীর্ঘদিন ধরে অবসরে গিয়েও গ্র্যাচুয়িটির টাকা পাচ্ছেন না কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তর ও ১৫ টি চিনি কলের ২৭৩৫ জন কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের গ্র্যাচুয়িটি ফান্ড দিতে পারছে না চিনি করপোরেশন। পাওনা টাকার জন্য দিনের পর দিন তারা ধরনা দিচ্ছেন করপোরেশনের কর্তাদের কাছে। কিন্তু কেউই টাকা পাচ্ছেন না। এ নিয়ে সমপ্রতি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সংবাদ সম্মেলন করে তাদের পাওনা দেয়ার দাবি জানিয়েছেন। জানা যায়, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশনের অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের পাওনা গ্র্যাচুয়িটির অর্থ দেয়া বন্ধ রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। অবশ্য চিনি করপোরেশন কর্মকর্তারা বলছেন, তাদের হাতে কোনো টাকা নেই। ভোক্তভোগীরা তাদের কাছে দিনের পর আবেদন দিয়ে যাচ্ছে না কিন্তু পরিশোধ করতে পারছে না। জানাগেছে, প্রতিষ্ঠানটি শুরু থেকে কর্মকর্তা- কর্মচারীরা বছরে একাধিক ইনক্রিমেন্ট নিলেও গ্র্যাচুয়িটি ফান্ডের জন্য কোনো উদ্যোগ নেননি যার কারণে এই দশার সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে গ্র্যাচুয়িটি ফান্ডের জন্য দেয়া অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন শ্রমিকের আবেদন ঘেঁটে দেখা যায়, বেশির ভাগই বৃদ্ধ ও বিভিন্ন জটিল রোগে ভুগছেন। অর্থাভাবে তারা তাদের চিকিৎসা সেবা নিতে পারছেন না। এর মধ্যে কেউ কেউ চিকিৎসার অভাবে মারাও গেছেন।

প্রকল্প নিয়েও কাজ হচ্ছে না:

লাভে আনতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকল্পের কথা বলা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। চিনি শিল্পকে লাভবান করার জন্য দুই প্রকল্প ইতিমধ্যে হাতে নেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে চিনি করপোরেশন। কিন্তু কোনোভাবেই সেই প্রকল্পগুলোকে সচল করতে পারছে না সংশ্লিষ্টরা। শুধু তাই নয়, এসব প্রকল্প দিনের পর কাগজে-কলমেই দেখা যাচ্ছে। এদিকে আরো একটি প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির সূত্র বলছে এসব প্রকল্প উদ্যোগ নেয়া হলেও মন্ত্রণালয় থেকে কোনোভাবেই অর্থ পাচ্ছেন না তারা। জানা গেছে, চিনিকলগুলোকে লাভজনক করতে পর্যায়ক্রমে প্রতিটি চিনিকলে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, চিনিকলগুলোর

আধুনিকায়ন, ডিস্টিলারি ইউনিট স্থাপন, জৈব সার উৎপাদন, মিনারেল ওয়াটার প্লান্ট, জুস প্লান্ট স্থাপনসহ বিভিন্ন পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি সুগার মিলগুলোতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বসানোর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এতে সুগার মিলগুলো নিজস্ব চাহিদা পূরণ করে অবশিষ্ট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহের মাধ্যমে বড় অঙ্কের মুনাফা তৈরির সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ ছাড়া কেরু অ্যান্ড কোম্পানি আধুনিকায়নে ১৫০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। কোম্পানির ডিস্টিলারি ইউনিট অটোমেশন করা হচ্ছে। জানা গেছে, রাজশাহী চিনিকলে আধুনিক জুস ফ্যাক্টরি করা হবে। গাইবান্ধার মহিমাগঞ্জে (রংপুর সুগার মিলস) একসঙ্গে ১৮০০ একর জায়গা রয়েছে, যেখানে ১৯টি বড় পুকুর রয়েছে। সমপ্রতি সেগুলো উদ্ধার করে বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য চাষ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া পঞ্চগড় ও সেতাবগঞ্জ সুগার মিলে মিনারেল ওয়াটার প্লান্ট স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি সরকারি চিনিকলগুলোতে র-সুগার আমদানির অনুমোদন দেয়া হবে বলেও জানা গেছে। এজন্য কারখানাগুলোতে রিফাইনারি স্থাপন করা হবে। এরই মধ্যে নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলে রিফাইনারি স্থাপনের কাজ চলছে। এ ছাড়া জিলবাংলা সুগার মিলসহ আরো তিনটি চিনিকলকে র-সুগার আমদানির অনুমতির অপেক্ষা। ফলে দেশীয় চিনি উৎপাদনের পাশাপাশি র-সুগার পরিশোধন করে সাদা চিনি উৎপাদন করলে রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলোর উৎপাদন খরচ কমবে।

চেয়ারম্যানের বক্তব্য:

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্যশিল্প করপোরেশন (বিএসএফআইসি'র) চেয়ারম্যান সনৎ কুমার সাহা বলেন, এই সংকট দীর্ঘদিনের। এই থেকে উত্তরণের জন্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন। সরকারও চেষ্টা করছে সেটাকে কীভাবে লাভজনক করা যায়। শুধু চিনি উৎপাদন করে এখানে লাভ করা যাবে না । আমরা চিনি উৎপাদনের পাশাপাশি চিনিজাত পণ্য উৎপাদনে জোর দিচ্ছি। নানান ফুড আইটেম উৎপাদনে জোর দিচ্ছি। আমরা দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছি, কথা বলেছি। আমাদের আশাবাদ আমরা একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবো প্রতিষ্ঠানটিকে। তবে এখানে নানান অব্যস্থাপনা আছে। সিবিএ নেতাদের খবরদারি রয়েছে। তারা এক মাস কাজ করে তিনমাসের বেতন চান। সারা মাস বসে থাকেন। যেখানে একজন শ্রমিক লাগার কথা সেখানে দশজন শ্রমিক ব্যবহার করে শুধু শুধু। এসব চলতে থাকলে তো একটি প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো সম্ভব না। আমি আট-নয় মাস হলো এখানে এসেছি। এর মধ্যেই কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছি। যেখানে বছরে চিটাগুড় বিক্রি হতো ৬০ কোটি টাকার আমি আসার পর সেটা দ্বিগুণ হয়ে ১২০ কোটি টাকা হয়েছে। শ্রমিকদের বেতন ও গ্র্যাচুয়িটি ফান্ড নিয়ে বলেন, দেখন আমাদের এক কেজি চিনি উৎপাদন করতে খরচ ২শ' টাকা কিন্তু বিক্রি করি ৫০ টাকা। দেড়শ' টাকা আমাদের কে দিবে। সরকার এই এখানে কতো ভতুর্কি দিতে পারে। তারপরও আমি চেষ্টা করছি বিষয়গুলো কীভাবে সমাধান করা যায়। গ্র্যাচুয়িটি ফান্ড, শ্রমিকদের পাওনা বেতনসহ চিনি করপোরেশনকে ঘুরে দাঁড় করানোর জন্য আমি কিছু পরিকল্পনা নিয়েছি। এখন সবার সহযোগিতা না হলে সম্ভব না।